মৈত্রীশ ঘটক

অসংখ্য শঙ্খ

১
তাঁর বহুমূর্তি কর্মধারা নিয়ে একবার পরিহাসছলে বলেছিলাম, আপনার নাম শঙ্খ নয়, অসংখ্য হওয়া উচিত। উত্তরে পেয়েছিলাম তাঁর সপ্রশংসা ও সম্বন্ধে সেই বিখ্যাত একপেশে হালকা আমোদিত হাসি।

শঙ্খ ঘোষ শূন্ত কবি, প্রাবন্ধিক, চিত্রাবিদ, ভাষাবিদ, গবেষক, বর্তমানবিশেষজ্ঞ, অনুবাদক, সমালোচক এবং অধ্যাপক নন, তিনি ছিলেন বহু প্রজ্ঞাের অগাদিত মানুষের দিকদর্শক এবং অভিভাবকসম বন্ধু, এবং আমাদের বৃহত্তর সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক জগতে সদাজগত এবং সদানির্ভর্যস্তি নৈতিক দিশারি। এই প্রত্যেকটি ভূমিকায় তিনি তাঁর স্বপ্নিল প্রতিভা ও ভঙ্গিতে ভাব্য, যার তুলনা সমসাময়িক বা সাংস্কৃতিক অতীতের বাংলা কোন, যেকোনো স্থান ও কালের নির্ধারিত পাওয়া কাঠিন। এবং আমাদের এই ভঙ্গুর, ছায়ায়, এবং বিপন্ন সময়ে, বৃহত্তর সামাজিক পরিসমান্ত ভূমিকা ছিল একক, অনন্য ও অপরিমেয়। তাঁর অভাব আমাদের সমাজের সম্পর্কে জীবনে প্রতিনিধিত্ব অনুভূত হচ্ছে এবং হবে।

বাহিরের কেউ যিনি তাঁর পরিচিতি জানেন না কিন্তু তাঁর বিভিন্ন কাজের সাথে পরিচিত হলে ভাবতেই পারেন যে এই ভিন্ন ভূমিকায় নিশ্চয়ই একজন নন, একই নামের একধরে লোক যুক্ত। আবার অন্যভাবে ভাবলে, এই ভূমিকাগুলো কি আমাদের পরম্পরার সাথে বিযুক্ত? একটা কথা আছে না, অংশগুলির যোগফল সমগ্রের থেকে অধিক? প্রচলিত অর্থে কথাটির
অর্থ হল, অংশগুলির মধ্যে যে সম্পর্কিত (synergy)—যেমন সংগীতের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বদক ও গায়কের ভূমিকা—তাদের সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রভাব তাদের বাল্ক্য মোগফলের থেকে বেশি। শঙ্খ ঘোষের ক্ষেত্রে তার এই নানা ভূমিকার প্রভাব ছাপিয়েও অনেকটা অধরা থেকে যায়, যার রহস্য তার অনন্যাধিকারী ব্যক্তিত্বের মধ্যে নিহিত।

শঙ্খ ঘোষের প্রতি নিবেদিত এই শৃঙ্খলাগুলি বা festschrift—এর (যাকে, সংবর্ধনা বা বর্ণ-গুলো বলা যেতে পারে) অন্তর্বর্তী থেকে এই লেখা লেখার অনুরূপ আসার পর থেকেই একটা সংশয় বোধ করছি। বাংলা সাহিত্যের অনুরূপী পাঠক হলেও, আমি পেশায় অধিকনিতর গবেষক। যদিও জীবনচক্রের আমোদ মাধ্যমিকদিকে কোনো শিক্ষাকার্য টানেই গত দেড় দশক ধরে বাংলায় নিয়মিত লেখালেখি করছি এবং তা মূলত অধিকনিত-সমাজ-রাজনীতি নিয়ে হলেও একেবারে সংক্রান্তির জগতে বিচিত্র নয়, হওয়া সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, বাংলা কবিতার অনুরূপ আর শেষার্থীতি (সমাজমধ্যে ‘প্রতিশ্রুতি’ বলে একটি অনলাইন আলোচনাগোষ্ঠী পরিচালনা করি) প্রিয় শরের মধ্যে পড়ে। আর তা ছাড়া কৈশোর বয়স থেকে সব ব্যাপারে মাত্র দেওয়ার বদন্তস্তা তো আছেই। তাহলেও শঙ্খ ঘোষের কবিতা বা সাহিত্যসংস্কৃতি বিষয়ে লেখা প্রবন্ধ নিয়ে আমি আর নতুন কী বলতে পারি ভেবে দিয়াছি পড়লাম।

দোতানর সমাহারের একটা সৃষ্টি পেলাম বারোমাস পত্নীর শেষ প্রকাশিত সংখ্যায় (ডেডালিন সংখ্যা, ২০১৫)—যা সম্পাদক শী আশাকের সন্তানের প্রয়াসের সাথে সাথে বন্ধ হয়ে গেছে। আমার লেখা প্রবন্ধের কৃতজ্ঞতা বীকার অংশট্টক থেকে ২যেখানে লিখিতঃ ‘মানবসম্পদের বিকাশ যেহেতু এই প্রবন্ধকে একটা মূল বিষয়, তাই প্রত্যক্ষ এবং পরিপূর্ক কিছু শিক্ষকের ছাত্রীকার করার এই হলো মোক্ষ সূচনা।’ তার মধ্যে আমার স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষকের সাথে শঙ্খ ঘোষের ও নাম দেওয়া আছে। অথচ, কোনোদিন তাঁর ক্রস করিনি। প্রবাহী হবার কারণে তাঁর আনুষ্ঠানিক বক্তাত্ব শোনার সূচনা হয়েছে খুব কম। এমনকি তাঁর উল্টোভাবে ব্যাখ্যা নেবার সমক্ষেত্রে উল্টোভাবে ব্যাখ্যাত আড়ালেও অনেকের নিয়েছি খুব কম—আর যখন উপস্থিত থেকে ওঠে শঙ্খ ঘোষের স্মৃতি বিষয়ের কথা রাখা উচিত।

কিন্তু তাঁর সাথে দীর্ঘ একটা সময় জুড়ে—লেড়া শাখার কিছু বিষয়—পরিবারিত যোগাযোগের সূত্রে মুখোমুখী বল যোগ্য বছর আলোচনার সূচনা হয়েছিল, তার অনেকটাই তাঁর সাথে একান্ত কথোপকথন। মনে হলো, এই আশা সৌভাগ্যের ফলস্বরূপ তাঁর কাছ থেকে যেখানে বিষয় নিয়ে ভাবনা এবং আলোচনা করার কী শিখেছি, তাই নিয়ে তা কিছু কথাটা তো বলাই যেতে পারে।

একজন সতিকারের বুদ্ধিজীবী কিভাবে তাকেন, অন্যদের কথা শোনেন, এবং মতভেদ হলে কিভাবে আলোচনার মাধ্যমে সেই দূরছাড়কে অবিক্রম করার চেষ্টা করেন, তাই নিয়ে তাঁর কাছ থেকে অনেক কিছু শেখার আছে এবং নির্মল পরিসরে শেখার চেষ্টাও করেছি, যা নিয়েও কিছু আলোচনা হওয়া প্রয়োজন বলে মনে করি। কবি বা প্রবন্ধিক হিসেবে নয়, শঙ্খ
যৌথের অন্যদের সাথে বৌদ্ধিক আলোচনার স্বকীয় পদ্ধতি—এই বিষয়ের সীমিত পরিধির মধ্যে আমার বক্তব্য আবদ্ধ রাখব।

চিন্তা ও বুদ্ধিচার্জ জগতে যাব বাস করেন তারা একটা অন্যত দৈত্যজীবন যাপন করেন। তার একটা দিক হল তথ্য নির্জনতা—পড়াশুনা করা, নিজের ভাবনাচিন্তা আর সৃজনশীল অভিব্যক্তির (তা সে যে আকারই নিক না কেন—শিল্প, সাহিত্য, বা গবেষণা) বিবর্তনের নির্জন পথ ধরে একাকী পথচলা। আবার অন্যদিকে হল সামাজিক যুথচারীতার—কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া (যেমন, জীবনননদ দাস), যেখানে নিজস্ব বিষয় ও তার সাথে সম্পর্কিত অন্য নানা বিষয় নিয়ে যাব আর্থিক বা সহায়তার—তাদের সাথে আনুষ্ঠানিক এবং অননুষ্ঠানিক নানা মধ্যে মতের আদানপ্রদান—যার মধ্যে বক্তব্য, আলোচনা সম্পর্কে, আবার নিছক আদর্শ সবই আছে। অর্থাৎ, একই সাথে তীর্থভাবে একে আবার আবশ্যকভাবে সামাজিক দুই বৃতের মধ্যে সবদা আমাদের যাতায়াত।

এই যে সামাজিক বৃত্ত সেখানে মতের আদানপ্রদান অনেকভাবে হয়। এখন প্রশ্ন হল, আদর্শ আর আলোচনা, আলোচনা আর বিকার, বিকার আর বিকার এদের মধ্যে সীমারেখাগুলো কি? বড়ুত বা আলোচনা সম্পর্কে নির্দিষ্ট আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের অনুশীলন এবং বিভিন্ন অংশগুলোর পূর্বনিহিত অনুশীলনের আনুষ্ঠানিক নিয়ম। তার মানে যে সবসময় তামান্না হয় তা নয় (ভাবুত পরশুরামের ব্যবস্থাপনা শিক্ষায় শিক্ষার দাস্য গুরু কথা)—কিছু তাহলেও ধারণাগুলো নিয়ে অন্তত একটা স্পষ্টতা আছে। আদর্শ-আলোচনা-বিকার-বিকার এদের কোনো ধারণা, অনুষ্ঠান নেই, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান বা আস্তিস্রোতের হওয়াটাই চল। তাই একটা থেকে আরেকটায় খুব সহজেই চলে যাওয়া যায়। আর কিছু ক্ষেত্রে আপাতত মনে হয় যে আর আসলে যা হচ্ছে সে দুটো আলাদা হতে পারে—আপনি ভাবছেন আদর্শ বা আলোচনা হচ্ছে কিন্তু তালয় তালয় বিকারের একটা চোরাচোর বইছে এটা হতেই পারে।

আদর্শের মূল উদ্দেশ্য বিনোদন এবং ভিন্ন বিষয়ে মতের আদানপ্রদান। এর মধ্যে একটা নিতান্ত সামাজিক দিক আছে—আদর্শ থেকে কিছু শিশু না শিশু বা অন্য কোনো উদেশ্যাস্থান হোক না হোক (যেমন, কোনো সাধা আলাপ হওয়া বা কারও বাধ্যে ভালো চা বা চানাজুরির খাটাহার লোভ)। মানুষ স্বভাবত যুথচারী আর তাই তার ধর্মনীতি বড়ুত সহজমীলের সাথে বেঁধে বেঁধে থাকার অমোট আকর্ষণ:

কিছুই কথাত্ত যদি নেই
তবু তো কজন আছি বাকি
আয় আরো হতে হতে রেখে
আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি।

[শঙ্খ যৌথ, ‘আয় আরো বেঁধে বেঁধে থাকি’]

৪২ | নগ অফারের গায়ে
আড়ার মূলে যদি থাকে একটা খেঁজা খুশী ব্যাপার—তার আঁকিক এবং বিষয়বস্তু একেবারেই ধরারও ছাঁচের বাইরে—আলোচনার লক্ষ্য কিন্তু খানিকটা নির্দিষ্ট। প্রতাশা থাকে কেনো বিষয়ের পরিধির মধ্যে তার প্রবাহ বাইরে এবং কথাবার্তা তার বাইরে চলে গেলে তাকে অপ্রাসঙ্গিক মনে করা হবে। আলোচনার মূল উদেশ্য জানা, সে কেনো বিষয় নিয়ে বা কারের মতামত নিয়ে হোক। বিতর্কের গোঁড়ার কথা হল একটা নির্দিষ্ট মতপার্থক্য আছে, এবার যুক্তি-তথ্য, ব্যক্তিগত পছন্দ বা রুচি, অথবা কেনো মতাদর্শ বা নীতির (স্নৈতিক হোক বা নাদন্দিক) নিরিখে নিজেদের অবস্থানগুলো প্রতিষ্ঠা করার প্রার্থনা—সে যার সাথে বিতর্ক তার কাছেই হোক, বা অন্য কেউ যদি উপস্থিত থাকেন, তাদের কাছে। বিতর্কে অধিকাংশ সময়ই হারজিতের নির্পত্তি করা যায় না কিছু মতবাদের কারণ খারাপটা পরিকার হয়। আর ভালো বিতর্কের একটা ফল হল ভিন মতের স্পৃষ্টকে মুক্তি এবং তথ্যগুলো জানলে নিজের বক্স আরো জানানো করার সুযোগ পাওয়া যায়। আর ঝগড়া, অর্থাৎ উন্নত বাকাবিনিয়ম যার ফলে মতান্তর থেকে মনান্তর শুধু নয়, মনোমালিন হয়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল? ঝগড়ার একমাত্র উদেশ্য হল প্রতিপক্ষকে পর্যাপ্ত করা। যতক্ষণ না কারও দম বা গলার জের বা সৌজন্যবোধে টান পড়ছে—বা, অন্য কেউ পরিহিতি সামলানো এবং শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য হাতক্ষেপ না করছেন—তরজা চলতেই থাকে, কারণ বিশ্বাস মানেই হার সীকার।

আগেই বলেছি, আড়ার, আলোচনা, বিতর্ক, আর ঝগড়ার মধ্যে সম্পর্ক কেনো সরল জ্ঞানিতের নিয়মে বাঁধা থাকে না, কথাবার্তার ধরন একটা থেকে আরেকটায় গড়িয়ে মেতে পারে অনায়াসে—ঠিক যেমন উঁচুতার ফাঁজকে একই জিনিস বরফ, জল ও বাপের রূপ নিতে পারে।

সংঘাত সবদাই ক্ষতিকারক, তাই সংঘাতের সম্ভাবনা থাকলে এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। জেনে বুঝে ঝগড়া করার কেনো অর্থ হয় না। যদি জানি কারের সাথে মতের গভীর অমিল, তাহলে তার সাথে আলোচনা—এবং বাধা হলে সংঘর্ষ এড়িয়ে যাওয়াই বাজাগুনীয়। রুচি বা মতাদর্শ নিয়ে মৌলিক পার্থক্য থাকলে, সেখানে তর্ক করার খুব একটা অর্থ হয় না। বুদ্ধিত বসু ১৯৪০ সালে লেখা একটি প্রবন্ধে লিখিয়েছিলেন, যে খাওয়া-পরা, আমোদ-প্রমোদের রুচিবিভেদে খুব একটা কিছু এসে যায় না—এইসব ক্ষেত্রে মতান্তর থেকে বিতর্কের বা মনান্তরের সম্ভাবনা কম। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে রুচি বা মতাদর্শর বৈষম্য এত মৌলিক যে সেখানে বিরোধ এবং মনান্তর অবধারিত আর তাই এসব ক্ষেত্রে পরস্পরকে এড়িয়ে যাওয়াই শ্রেয়। তার একটি উদাহরণ হল সাহিত্যের জগত থেকে। তার কাছে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধাপূর্ণ কেউ না হলে, তার সাথে আলোচনার অর্থ নেই, ‘কেনো রবীন্দ্রনাথকে যিনি অনিবা করেন, তিনি আমার অন্তমুক্তি অধিকার করেন, যেহেতু রবীন্দ্রনাথের ভিত্তির উপরেই আমি দাড়িয়ে আছি।’ আবার আমরা রাজনৈতিক মতাদর্শের জগৎ থেকে যদি উদাহরণ নিই, তাহলে কেনো
রাজনৈতিক নেতাকে কেউ যদি মহান বলে মানেন আর কেউ ভাবেন যেস্থায়চারী একনায়ক, সমাজের কোনো অংশের প্রতি কেউ যদি বৈষম্যমূলক ভাব পোষণ করেন (যেমন, ধর্মের ভিন্নতার ভিতৃ) আর কেউ মনে করেন আদর্শ হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে কোনো আপেশ করা যায় না, সেখানে খুব বেশি আলোচনার জায়গা নেই। দুই ভূখণ্ডের মধ্যে কোনো সেতু বা যানপরিবহনের ব্যবস্থা না থাকলে যেমন যাতায়াত অসুবিধা, সেকথা মৌলিক মতাধিকার থাকলে তা নিয়ে বিতর্কের কোনো সমাধান নেই। তাই, রুচি আর মতাধিকার নিয়ে মৌলিক পার্থক্য থাকলে, সেখানে তর্ক করার খুব একটা অর্থ হয় না। আলোচনা হলে শুধু ততক্ষতাই হয়।

কিন্তু তার মানে আরো অনেক অবিশ্বাস্য ব্যাপারের মতো যা করা উচিত বা উচিত না, আর যা হয় সেদুটো সবসময় এক হবে এমন আশা করা যায় না। বন্ধুদের মধ্যেও সবসময় উত্তম বিতর্ক কি। এড়ানো যায়? কবিরই ভাষায়:

চলামন নপুণে
হুত তুলেছি শুনে
খোলা বুকে শুধু খোলা হতে থাকে
তরল পাপে ও পুণে
ভিক্ষার হয়েছি দরজায়
অন্দরে প্রায় গর্জায়
বাইরে সদরে অন্ধ ও কানা
বন্ধুরা মা তরজায়।

[শঙ্খ যোগ, ‘তরজা’]

যে মতাদর্শের কোনো মিলনবিন্দু নেই, তা নিয়ে বিতর্কের লেগে যাবার একটা কারণ হতে পারে, একে অন্যের মতাদর্শ সম্পর্কে সমাক্ষেত্রে অবহিত না থাকা এবং কথাগুলো মতাদর্শের উমোচিত হওয়া। কিন্তু মৌলিক কিছু বিষয়ে বন্ধুদের মতাদর্শ সম্পর্কে একেবারে অবহিত না থাকার সম্ভাবনা। কৈ। তবে সময়ের সাথে মানুষের ধানধারণা পালটাতে পারে এবং সেটা হলে বন্ধুদের মধ্যেও অন্তর্টিক্রম মতাদর্শ এবং বন্ধুবিন্দুর হবার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে:

এক দশকে সজ্জা ভেঙে যায়    থাকে শুধু পরিত্রাণী
বাতির আবর্তে ঘূণীঘূর,    কার শির ছেড়ে মুদর্শন?
‘মিঠাচারী মিঠাচারী, শঠ,    আমিই মহান, দেখ আমাকে’
জিন হয়ে যায় শিষ্পলাল    এক দশকে সজ্জা ভেঙে যায়!

[শঙ্খ যোগ, ‘সজ্জা’]

তবে সব তর্ক রুচি বা মতাধিকার নিয়ে নয়। কিছু উঠে আসে কোনো কিছু সম্পর্কে আলাদা ব্যাখ্যা থেকে। তথ্য বা প্রমাণ যেহেতু সচরাচর সীমিতই হয়—লে সাংস্কৃতিক জগতে হেক বা রাজনৈতিক সামাজিক-অর্থনৈতিক বিষয়ে হেক, এমনকি ক্রীড়াজগৎ—তাই কে ঠিক সেটা
নিষিদ্ধভাবে প্রমাণ করা যায় না। এক্ষেত্রে আলোচনা বা বিতর্ক কিছু বিভিন্ন মতামতের পিছনে যুক্তি ও তথ্য উদ্ভাবনে একটা বড়ো ভূমিকা নিতে পারে। বিদ্যাচর্চা বা গবেষণার জগতে একক বিতর্ক সবসময়ই চলে—এর উদ্দেশ্য আমাদের যুক্তি বা তথ্যের মেগুলো দুর্বলতা সেগুলো বুঝে তাদের আর জোরদার করা। সেখানে বিতর্কের শেষে সবাই একমত হবেন আশা করা যায় না, কিন্তু পরস্পরের অবস্থান নিয়ে ধারণাটা খানিক পরিস্কার হওয়ার কথা। আসলে সবাই একমত হওয়া সত্বর শুরু নয়, কাজকর্তা নয়। আমাদের নিজেদের চিন্তাভাবনার বিবর্তন, জীবনের অভিজ্ঞতা এইসব মিশে যে মতামত তৈরি হয়, তা শুধু আমাদের কাছে মূল্যবান নয়, অন্যদের কাছেও তার মূল্য আছে। সেইজন্যই আমরা নানা বই পড়ি, নানা লোকের বক্তব্য শুনি। তার উদ্দেশ্য শুধু আমাদের নিজস্ব জগৎ অনুপ্রেরনার স্বপক্ষে প্রমাণ সংগ্রহের ফলা, বিপুল এবং বিচিত্র এই জগৎসংসারে নানা বিষয় নিয়ে আমরা কতটা জানি, কতটা জানি না, এবং কতটা জানি সত্বর তার এক মানসিক মানচিত্র তৈরি করা। বেড়াতে গিয়ে কোনো জাগরণ ভালো লাগলে সেখানে বসবাস শুরু করতে হবে যা যেমন নয়, সেরকম বিভিন্ন মত ও দৃষ্টিভঙ্গির সাথে পরিচিত হওয়া মােনেই সেগুলো সাবিকভাবে প্রচুর করার কোনো আবশ্যকতা নেই। বরং, মতভেদ স্বাভাবিক করণ সবাই সবার সাথে সব কিছু নিয়ে একমত হলে আর কথাবাঁচার কোনো বিষয় থাকবে না যে।

কিন্তু সবাই কি এই বহুমতের বহুবিধে বিশ্বাস করেন? বা তত্ত্বের বিশ্বাস করলেও নিজের জীবনে তা প্রয়োগ করেন? বিবাদে জড়িয়ে পড়ার প্রবণতা আমাদের সবার মধ্যে আছে, যদিও আমরা জানি যে কাউকে প্রভাবিত করা বা কারো মত পরিবর্তন করা যদি উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তাকে আকর্ষণ করার কথানোই কার্যকর হয় না। এ কি মানুষের এক আদিম হিংস্র সত্য প্রতিফলন যাতে উপলব্ধি ও জ্ঞানের আলোর স্বচ্ছতার বদলে আপাতন্ত্রী উত্তাপ আমাদের অনু করে দেয়, যখন ‘মারের জবাব মার’ হয়ে ওঠে বাক্যমুক্তির মূলমন্ত্র?

মারের জবাব মার
কিন্তু তাও বেতরে দাও ছনের ঝংকার
মারের জবাব মার।
কথা কেবল মার খায়না কথার বড়ো ধার
মারের মধ্যে ছলকে ওঠে শর্শের সংসার।

[শঙ্খ ঘোষ, ‘লোগান’]

মতামত যখন মনান্তরে পরিণত হয়, তার ফলে চিরতর বর্ধিত অবর্ধি হতে পারে। কেঁধেই তা কাম্য নয়, করণ কারও সাথে যদি ব্যপক থাকে তার মানে তার সাথে অনেক বিষয়ে মতের ও মনের মিল আছে বলেই সে বর্ধি। আগে না জানা থাকলে আর তত্ত্বের ফলে এই ফাটলেরেখাগুলো উদ্ভূত হলে, এসব প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়াই ভালো—যাকে বলা হয় ‘বিদ্যমান হওয়া নিয়ে একমত হওয়া’ (agreeing to disagree)।

অসংখ্য শঙ্খ | 85
কিছু তা সত্ত্বেও, অনেকসময় আমারা এ ধরনের সংঘাত এড়িয়ে উঠতে পারি না। এখন 
প্রশ্ন হল, যে সামাজিক আদানপ্রদানে সমৃদ্ধি হবার এবং একমত না হয়ে বহুমতের বহু উদযাপন করার অবধি সজ্জিত, যেখানে কোন মনোভাব থেকে আমারা মেনে উঠ শঙ্কারের 
রণযুদ্ধে, যতই থাকানা তার বৌদ্ধিক বা নান্দনিক ধার? বিতর্কে শেষ কথা বলার লোভে, 
কোন বর্বর জয়ের উক্তাসের আশায় আমারা বাল্লিগোত ও সামাজিক সম্পর্কে আঘাত হানি?

আমাদের সবার মধ্যে একটা অপরিণামশীর দিক আছে যার থেকে মুহূর্তের তাড়নায় 
আমারা অনেক কিছু করে ফেলি—বেশি কথা বলি, বেশি খাই, বেশি সময় নষ্ট করি—আর 
তারপর মনে হয় না করলেই হত। তাই সমস্যাটা কি আত্মসংঘে যার অবধারিত ফল 
হল পরে পাস্তানো?

ঘরে ফিরে মনে হয় বড়ো বেশি কথা বলা হলো?

cতুরতা, কঠোর লাগে খুব ?

মনে হয় ফিরে এসে স্নান করে ধূপ জেলে চুপ করে নীলকুঠিরিতে 

বসে থাকি?

মনে হয় পিশাচ পোশাক খুলে পরে নিই 

মানব শরীর এককার?"

[শঙ্খ ঘোষ, ‘মূর্ধ বড়ো, সামাজিক নয়’]

নাকি আমাদের রক্তের মধ্যে আছে দলাদলির বা গোষ্ঠিতত্ত্বের প্রবণতা? সব বজ্রবাকী 
আমারা অতিসরলীকৃত কিছু শোনীতে যতক্ষণ না ঠেলে ঢোকাতে পারছি, আরাম নেই—সে 
বাম বা ডান, প্রতিষ্ঠানপ্রাক্তি বা প্রতিষ্ঠানবিশেষী যাই হোক না কেন। কিন্তু এটা করতে গিয়ে যা 
হারিয়ে যায় তা হল বাল্লিগোতের সূক্ষ্ম ব্যঞ্জনা এবং তার সাথে সমষ্টিগতভাবে মতামতের 
বহুবেবায়ির সম্ভাবিত টাই:

বাসের হাতে কেউ কুত্ত পায় এখে এলে 

আগে তাকে প্রশ্ন করো তুমি কোন দলে 

তুম্হারা মুখে ভরা গ্রাস তুলে ধরবার আগে 

প্রশ্ন করো তুমি কোন দলে 

...

কী কাজ কী কথা সেটা তত বড় কথা নয়।

আগে বলে। তুমি কোন দলে।

[শঙ্খ ঘোষ, ‘তুমি কোন দলে’]।

নাকি এর জন্যে আসলে দায়ী আমাদের মৃৎচরেরীতর তলায় তলায় সদাভবন্ধান অহমিকার 
চোরাভোট? আমি-ই ঠিক, বাকিরা ভূল; আমি-ই সৎ, বাকিরা মতবদন; আমি-ই আদর্শসী, 
বাকিরা আদর্শত্রু; আমি-ই বিষাদ, বাকিরা অজ; আমি-ই বুদ্ধিমান, বাকিরা নির্ব্বোধ। এদিকে 
মানুষ তো স্বভাবগতভাবে আশ্রয়ভিত্তির:

৪৬ | না অনের গায়ে
সকলেই একটা আশ্রয়ের কথা ভাবছে, জম্মুকুর্দ থেকে সে-কোনো মানুষের সেইটিই সবচেয়ে বড়ো সন্ধান, সেই হারাকারই সবচেয়ে বড়ো হারাকা। সবই হয়তো সে-বিষয়ে সচেতন থাকে না সবসময়। আবার থাকতে আরেকে। বিশেষত নির্জন একাকিতের মুহূর্তগুলিতে।

কয়েকদিন আগেই একটা লেখায় বলেছি: বাঁকুন্তের সঙ্গে বাঁকুন্ত, বাঁকুন্তের সঙ্গে সমাজের, বাঁকুন্তের সঙ্গে বিশ্বজগতের একটা পরবাসসম্পর্কে বাঁধা আছে মানুষ। আজীবন পরবাসী সেই মানুষ চিরকালই শুধু আশ্রয়িতারি। কেউ তা জানে, কেউ-বা জানে না। ['সকলেই একটা আশ্রয়ের কথা ভাবছে': শঙ্খ ঘোষ, বইরে-দেশ, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯, সুমন মুখোপাধ্যায়ের সাথে কথোপকথন।]

তাহলে কি এক অত্যাধুনিক অহংকারী অসংখ্য আশ্রয়ের কথা ভাবছে, এ ‘আমি’-র সৃষ্টিক্ষুদ্র তব্যবাহিতে ছিল করে ফেলে সম্পর্কের আশ্রয়ীজাল, যার অবধারিত ফল হল একাকিতবোধ?

চিত্ত ও বুদ্ধিচর্চার জগতের দুই আপাতবৃদ্ধিতে পরস্পরবিরোধী দিকের কথা দিয়ে শুরু করেছিলাম—সংক্ষেপে যাচ্ছে আমাদের মনে ও বাঁকুন্ত দিক বলা যেতে পারে। আদর্শগতভাবে সম্পর্ক হলেও, অনেকসময়ই আমাদের নিজস্ব কিছু প্রবণতার জন্যে এই দিকগুলোর মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব এসে যায়, যাতে হয় আমাদের একাকিতবোধ আরো গভীর হয়ে বিচ্ছিন্নতাবোধে পরিণত হয়, নয়নে যৌথজীবনের মঞ্চগুলো কষ্টকারী হতে থাকে, যা অগ্রাহ্য, আঘাত এবং মলিনতার জমা দেয়।

এই দশদিকের থেকে কি মুক্তির কোনো পথ আছে? শঙ্খ ঘোষের সাথে দীর্ঘকাল জড়ে অনেক কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে এই বিষয়ে শক্তিশালী কিছু দিক আছে বলে আমি মনে করি। কিন্তু বাঁকুন্তের পরিচয় নিরক্ষিত এই দিকগুলির প্রতিফলন তার নিজস্ব নানা লেখা বা সাক্ষাৎকার এবং তার বাঁকুন্তের সর্বজনবিদিত কিছু বৈশিষ্টের মধ্যে নিহিত আছে।

এবার সেই প্রসঙ্গে আমি।

যেকোনো কথোপকথনের একটা অংশ হল শোনা, অনুটাই হল বলা। অথচ তালো করে শোনার ক্ষমতা খুব অল্প লোকেরই আছে। ১৯৩৫ সালে একটি লেখায় আর্নেস্ট হেমিংওয়ে তুলনা লেখকদের পরমাণুর দিয়েছিলেন: ‘যখন কেউ কথা বলবে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে শুনবে। কী বলবে যাছে ভাববে না। অধিকাংশ লোক কখনো শোনানো না।’

আমি আমার বাঁকুন্তের পরিচয়ের জগতে শঙ্খ ঘোষের মতো মনোযোগী কোথা খুব কম দেখেছি। শোনা মানে খুব চূপ করে অনাকে কথা বলতে দেওয়া। যা সাক্ষাৎবোধ থেকেও আসতে পারে। শোনা মানে অনায়ারে কথা বলতে দিয়ে তারপর নিজের মতমত সজ্জায় ঘোষণা করা নয়। ভাবাভাবে শোনা মানে কেউ কী বলছে এবং কেন বলছে সেটা বুঝতে চেষ্টা করা, এবং তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তার বুক্কারে বুঝতে চেষ্টা করা। তার মানে তার সাথে একমত হওয়া নয়, বরং নিবিড় কৌতূহলে তার চিন্তাধারা বুঝতে চেষ্টা করা।
মন দিয়ে শোনার প্রধান সূচনা হল, এতে বস্তুর আস্থা অর্জন করা যায়। যিনি বলছেন তিনি যত গভীরের গ্নে এবং বিশ্লেষাধীন তার বস্তু বলবেন, এই মতামত কেন একজন পোষণ করেন কেন পন্যে অনেক ভালো বোঝা যায় এবং বিষয়টি নিয়ে আমাদের বোঝার গভীরতা বাড়ে।

বোঝা মানেই একমত হওয়া নয়—অন্যান্যের মতের আলোকে আমরা নিজেদের মতকে আরো ভালো করে যাচাই করতে পারি, এবং তার স্পষ্টতা মুক্তি আরো ভালো করে শানিয়ে নিতে পারি।

এখন এ কথা ঠিক যে সবার সব কথা শুনলে সবসময় নে নতুন উপলব্ধি হয় তা না, কিন্তু শোনার ধীরের না থাকলে যে ক্ষেত্রে বুঝা লাভ হত সেই সুযোগগুলো হাতছাড়া হয়ে যায়। আরেকভাবেও দেখা যায়—উত্তর বিতর্ক থেকেও তো কিছু শেখা যায় না, বরম তাতে মনেমালিন্য হলে তার ভার আমাদের বহন করতে হয়। তার থেকে মন দিয়ে শোনার অভ্যাস করা অনেক শেষ।

এর কথা খুব সহজ, কিন্তু কে না জানে?

সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়।

[শঙ্খ পঘাষ, 'সমন্ধিশ্রী']

আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে একটা গল্প বলি। হায়রাও বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনাতে পিএইচ.ডি শেষ করে আমি একাধিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর সুযোগ পাই, যার মধ্যে আমার অধুনা কর্মক্ষেত্র লতন স্কুল অফ ইকনোমিক্স-এ থাকি। আমি যোগ দিয়েছিলাম মুম্বাইচারপন্থী অধ্যাপনার পীঠভূমি শিক্ষক। বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমি আজীবন মতাদর্শগতভাবে সামাজিক, তা ছাড়া সেই সময় আমার গবেষণার অন্তর্গত বিষয়ও বৃহত্তর বিষয়ের, তাই অনেকেই অবাক হয়েছিলেন এই কর্মস্থল নির্বাচনে। আমি নিজেও এটা নিয়ে দিয়েছিলাম—যতই হোক পরিচিত চিন্তাভাবনার এবং সমবদ্ধ মতাদর্শের পরিবেশে কাজ করার আরাম অনেক বেশি।

আমি আমার শিক্ষক ছাড়াও আর যে অল্প কয়েকজনের পরামর্শ নিয়েছিলাম, তাদের একজন শঙ্খ মহোৎ। তিনি বলছিলেন, এইরকম অভিন্ন এবং আপাত্বভাবে অন্যান্যের পরিবেশে কাজ করার একটা মাধ্যম বিকাশের জন্য সবচেয়ে বেশি সহায়। তিনি যেমন জোরদার বোঝানোর মুখোমুখি হলেই ব্যাটিংয়ের দম্পত্তা বাড়ে।

ফিরে আসি বিতর্কের কথায়। তার সাথে সাহিত্য নিয়ে তর্ক কখনো হয়নি—যতই হোক, অল্পবয়সের অত্য্কিনী আমাদের মধ্যে আছে। কিন্তু কিছু কিছু ক্ষেত্রে মতবাদ্ধ হয়েছে।
তখন উনি ওঁর স্বভাববিশ্বাস ভঙ্গিতে বেঁচার চেষ্টা করেছেন, কিনা বলচি, কেনা বলচি, কথনেই উড়িয়ে দেননি ‘তুমি বোঝো না’ বা ‘আমি বলচি, শোনে’ বলে। একটা উদাহরণ দিয়া কার কবিতা ভালো লাগে এই আলোচনার সৃষ্টিভাবনাধর কবিতা আমার অত্যন্তকরণ দুর্বৈত্য লাগে এবং অভিধান নিয়ে না বসলে পড়ি যায় না এই মর্মে কিছু বলেছিলাম, যা একটি পরিচিত অভিযোগ। উনি একমাত্র হলেন যে কিছু কবিতায় এমন শব্দের ব্যবহার আছে, যেগুলো পরিচিত নয় এবং অন্যভাব পাঠক হাওক থেকেই পারেন। কিন্তু তার সাথে উনি কিছু কবিতার উদাহরণ দিলেন যাতে মানতেই হয় ওঁর অনেক কবিতাই আছে যেগুলো কিছু অত খটোম্বাটো নয়। শুধু তাই নয়, সেই কবিতাগুলো নিয়ে আলোচনাপ্রসঙ্গে বুঝতে পারলাম বিদ্বেষ একজন পাঠকের কেন সৃষ্টিভাবনাধর দত্তের কিছু কবিতা ভালো লাগে।

এই উদাহরণ থেকে যেটা শেখার সেটা হল, উনি মন দিয়ে গুরুত্ব দিয়ে আমার কথা না শুনলে ওঁর মতো একজনের কাছে আমি কবিতা নিয়ে আমার মতমতই প্রকাশ করতাম না। শুধু তাই না, উনি আমার কথা উড়িয়ে না দিয়ে যেতান্ডে তা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন সেটা তাঁর বৈষ্ণবের জোর দিয়ে নয়, আমাকে বা পাঠকরা নিজেই আরে। ভালো করে ভেবে দেখার দিশা দিয়ে। আর আমি যেটা শিখলাম যে, বিদ্বেষ একজন পাঠকের কেন সৃষ্টিভাবনাধর দত্তের কিছু কবিতা ভালো লাগে—যেমন, তাঁর কবিতায় ছন্দের প্রয়োগ—তার একটা আভাস পেলাম। এতে আমার প্রাথমিক পছন্দ-অপছন্দ না পালটালেও, কবিতার বসায়দন করার ক্ষমতা সমৃদ্ধ হল। উৎকর্ষ ও ভালো লাগার তো অনেকগুলো মানুষ থাকে এবং বাদ্যবিশেষে সেগুলোর গুরুত্ব আলাদা হতেই পারে, তাই আলোচনা করলে যে মানুষগুলো নিয়ে আমরা অতটা সচেতন নই, সেইগুলো সম্পর্কে আমাদের চেতনা সমৃদ্ধ হয়।

জীবনচক্রের আমোদ আবর্তনে কিছু কিছু ধারণার, ভালো লাগা পালটে যেতে বাধা। আগের ‘আমি’রা আর পারের ‘আমি’ সবাই যদি একজাতীয় জোড়া হতা—খানি পরগুলামের ‘ভুষণীর মাঠ’-র মতো—তাহলে হয়তো প্রবল বিতর্ক লেগে যেত। আমারা নিজেরাও যেমন বললে যাই, সেকরম বাইরের পৃথিবীও নিয়ে পরিবর্তনশীল আর তাই কোনো বিতর্কেই আমি লে বাড়ি সই সম্পূর্ণ নির্ভুল এটা ভাবার অর্থ হয় না। কিন্তু যেহেতু কল্পনাজনকের সময়যান আঘাতে নেই, বিভিন্ন সময়ের ‘আমি’র সাথে কথোপকথন অসম্ভব। তাই আমাদের সাথে আত্ম-আলোচনা এবং বিতর্ক ছাড়া আমাদের চিন্তার বিতর্ন হতে পারে না, আমরা বাড়াবাড়ি চিন্তার একটা দুঃখদূয়ার কক্ষে আটকা পড়ে যেতে বাধা।

আর সেটা থেকায় না রাখলে এবং আরেকজন কেন কোনো কথা বললে সেটা না ভাবলে অবধারিত ফল হলো দুই কথার বর্তমান পরস্পরের সাথে মুখোমুখি ধাক্কা লাগার মতো। সেখানে কে ছিটে পড়ল আর কে দাঁড়িয়ে থাকল, সেটাই মূল বিবেচ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। আমার জিত মানে তোমার হার, আর তোমার জিত মানে আমার হার—এক শূন্য অংকের খেলা।
এই বিকল্প আছে। যাদের সাথে আলাপচারিতায় আমার এই বিষাক্ত সূত্র হয়েছে, তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন শঙ্খ ঘোষ। এই যে বিকল্প, তার মূল দৈশিষ্টগুলো কি?

প্রথমতঃ, আমরা যদি বিতর্কে যুদ্ধ বা প্রতিযোগিতা না তোলে আত্মিয়ান বা অর্পণ ভবি, যেখানে কোনো কিছুর গভীরে গিয়ে রোখটাই মূল উদ্দেশ্য, তখন যাদের সাথে আলোচনা বা তর্ক হলে তারা আর প্রতিদ্বন্দ্বী নয়, সহ-পরামর্শ হয়ে ওঠে। সেই প্রক্রিয়ায় পরস্পরের মতবিনিময় ছাপিয়ে বড় হয়ে দাঁড়ায় আমাদের নিজস্ব চিন্তার বিরতন।

দ্বিতীয়তঃ, আমাদের নিজস্ব ভাবানুগত বিকাশের যে প্রক্রিয়া তা অন্তঃসলিলা নেদের মতো আমাদের চেতনার মধ্যে দিয়ে সবদা বহমান। এই প্রক্রিয়ার উপর আছে রাখার অর্থ হল, যে বিষয় নিয়ে মতবেদ, সেটা কঠুনি একটা সেন্টেন্ড করে ফেলতে হবে, একক কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। বিষয়টি সম্পর্কে আমাদের যৌথ কৌতূহল এবং অনুরাগকে মূলধন করে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য বা সময়সীমা ছাড়াই চলতে পারে এই কথাওকথন।

এর রূপসময় দেখা যায় পরে আমাদের মত কাছাকাছি শুধু আসতে পারে তা না—কিছু ক্ষেত্রে আমাদের অস্থায়ী পালটেও থেতে পারে। তাই প্রতিপক্ষকে পরুষপ্রতী না করে বরং তাঁর মনে কিছু প্রশ্ন, কিছু সংশয় জাগিয়ে দিলে তা তাঁর মতপরিবর্তনের সম্ভাবনা অনেক বেশি বাড়িয়ে দিতে পারে। মনে আছে, কলেজজীবনে আমার উত্তমপ্রতী চিন্তাধারায় গণতান্ত্রিক অধিকার বা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এগুলো খানিক বৃদ্ধিজীবীদের বিলাসিতা মনে হত। এই অধিকারগুলো যে কোনো বিশেষণ গোষ্ঠীর স্বাধিকার (entitlement) নয়, এর শিরোনাম যে আমার অনেক গভীর এবং সেখানে গল্প থাকলে গোষ্ঠী ব্যবস্থাটি নড়ায় হয়ে যেতে পারে, মনে আছে এই মর্মে শাস্ত্রে তাঁর বন্ধ্যা বলেছিলেন। বলাই বাছলে, ১৯৮৯ সালের আগে হওয়া সেই আলোচনায় কে ঠিক ছিলেন তা নিয়ে আজ দিভিত হবার অবকাশ খুব কম।

এই প্রক্রিয়া নিয়ে আরো তলিয়ে ভাববে ফিরে আসতে হয় সেই ‘আমি’-র ধারণায়। তাঁর একটি সাক্ষাৎকারে ধৃঢ়টিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে উদ্ধৃত করে তিনি বলছেন:

‘...মতামতের গোজামিতে মানুষ ছেট হয়ে যায়।’ সেই একই সাক্ষাৎকারে তিনি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলছেন: ‘কেবলমাত্র সৃষ্টির ভিন্ন ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম নয়, তাঁর কাজের ভাবের ভিন্ন ভিন্ন দিকও—মেমন পলিসিসঠন, শিক্ষাসংস্থার, রাষ্ট্রনীতি—এসবেরও মধ্যে কাজ করে গেছে একই মূলসূত্র। সূত্রটিকে এক কথায় রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন। বলেছিলেন যে আমাকে আমি থেকে ছাড়ি নেবার সাধারণ তিনি নিয়ন্ত্র ধরে রাখতে চেয়েছেন তাঁর জীবনে। একে তিনি বলেছিলেন, ‘আবরণ মোচনের সাধনা।’ [‘সকলেই একটা আশয়ের কথা ভাবছে’: শঙ্খ ঘোষ, বইয়ের দেশ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৯, সুমেত মুখোপাধ্যায়ের সাথে কথোপকথন।]
আবার অন্যত্র বলছেন:

‘আমার তো মনে হয়, সমস্ত শঙ্খই এই নিজেকে জানার শঙ্খ। কেননা, এক হিসেবে, নিজেকে জানার সম্পূর্ণতাই সকলকে জানার পাঠ্য।’ [শঙ্খ ঘোষ, ‘মর্ত্য কাছে শর্ষ যা চায়, এ আমির আবরণ, ১৯৮০]

এখানে শঙ্খ গুলো নয়, আরো বৃহত্তর অর্থে সমস্ত বৌদ্ধিক চতুর্থ ফেরে এই যুক্তি প্রযোজ্য। আর এই যুক্তি মানলে, বিষয়কে নিজের মত প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা অনত্য সমুদ্ধীরে দাঁড়িয়ে তুচ্ছ বালির প্রাসাদের দখল নিয়ে যুক্ত করার মতই অসার। সমুদ্র বা বালির কথায় তার এক বিখ্যাত প্রবন্ধের শেষ অংশটা মনে পড়ে যেতে পারে:

আমারও শুনিন এক টুকরো থেকে অন্য টুকরোয় অবিরাম যাওয়া, পা তোলা পা ফেলার মতো এক কবিতা থেকে আরেক কবিতায় পৌঁছায়। কেবল, বালির ওপর হীর্ধি বলে পিছন ফিরলে দেখা যায় বটে আপন আপন পদচিহ্ন। মুহুর্তেরই তাকে ধুয়ে নিয়ে যায় জল। [শঙ্খ ঘোষ, ‘পা তোলা পা ফেলা’, কবিতায় মুহূর্ত ১৯৮৭]

প্রসারিত অর্থে আমাদের জানায়ের যাত্রাপথের বালিতে পদচিহ্ন রাখতে রাখতে হঁটার মতো। তার অনেকটাই একক যাত্রা, অনেকটা অন্যদের পদচিহ্ন অনুসরণ, আর খানিকটা একসাথে কিছুটা পথ চলা। পদচিহ্ন ধুয়ে যেতে পারে, পরস্পরের সাথে মিশে যেতে পারে, কিন্তু পথ চলা অন্তত।

সূত্রনির্দেশ:


২. ‘অর্থ নয়, বৃত্তি নয়, সন্ধ্যর নয়—উন্নয়নের গতিকে সুচকের সদিতে’, করোমাস, বড়দাঁড়ি সংখ্যা ২০১৫।

৩. ‘মতাত্ত্ব ও মনাত্ত্ব’ (উত্তর-তিতিশ, নিউ এর্গার্ব্যার্স লিমিটেড, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৪৫)।

৪. এই বিষয়ে বিষয়ক বিষয়ে আমার ‘তরক বহুব’ (অনুষ্টুপ, শারদীয় সংখ্যা, ২০১৯) প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা আছে।